প্রশ্ন ৬০ মহাপঞ্চকের সঙ্গে আচার্য অদীনপুণ্যের বিরোধ বাধল কেন? কে, কোথায় অদীনপুণ্যের নির্বাসন দিলেন?

(একাদশ বার্ষিক, ২০১৪) ৪+১

উত্তর >> মহাপঞ্চকের সঙ্গে আচার্য অদীনপুণ্যের বিরোধের সূচনা গুরুর আগমনের পটভূমিকায়। আচার্য হওয়া সত্ত্বেও অদীনপুণ্যের মনে সংশয় "...হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।" 'অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা' অচলায়তনে তিনি যে শান্তি খুঁজে পান তা 'নিশ্চল শান্তি'। আত্ম-উপলব্ধির এই পথ ধরেই একদিন অদীনপুণ্য শাস্ত্রের শাসন আর শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসেন। মহাপঞ্চককে হতচকিত করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, উত্তর দিকের জানলা খোলার জন্য সুভদ্রর কোনো প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার নেই, 'যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার।' সুভদ্রকে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন যে সে কোনো অপরাধ করেনি, যারা বিনা অপরাধে মুখ বিকৃত করে তাকে হাজার হাজার বছরের ভয় দেখাচ্ছে পাপ করছে তারাই। অচলায়তনের উদ্দেশ্যে মহাপঞ্চকের স্পষ্ট বিদ্রুপ

ধ্বনিত হয় এবং মহাপঞ্চক এই ঘটনাকে চিহ্নিত করেন সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মের বিনাশ বলে। তাঁর কাছে এ হল আচার্যের 'বুদ্ধিবিকার' এবং এ জন্য মহাপঞ্চক স্পষ্ট ঘোষণা করেন—"এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।" এভাবেই আপাতভাবে সুভদ্রের উত্তর দিকের জানলা খোলাকে কেন্দ্র করে অদীনপুণ্যের সঙ্গে মহাপঞ্চকের বিরোধ বাধলেও এ আসলে মহাপঞ্চকের অন্ধত্বের সঙ্গে অদীনপুণ্যের আত্মজাগরণের দ্বন্দ্ব।

» স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত অদীনপুণ্যকে অচলায়তনের প্রান্তে দর্ভকপল্লিতে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৬১ *"শুনেছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।" —শিক্ষায়তন কীভাবে অচলায়তনে পরিণত হয়েছিল? সেখানে কারা লড়াই করতে এসেছিল এবং কেন?*
(একাদশ বার্ষিক, ২০১৪) ৩+২

উত্তর » রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুরু' নাটকে অচলায়তন আপাতভাবে শিক্ষায়তন হলেও শাস্ত্র, আচার-বিচার আর সংস্কারে নিমজ্জিত সেই আয়তন শেষ অবধি অচলায়তনেই পরিণত হয়। এই অচলায়তনে পাথরকে সত্য বলে মানা হয়, পাথরে ঘাস জন্মানো হয় নিন্দিত। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহ, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগ প্রজ্ঞপ্তি আর জ্বলনানন্তের আধিকর্মিক বর্ষায়ণে অচলায়তন পথের সন্ধান খোঁজে। আচার্য এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—"এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়..."। মুক্ত জীবনের বার্তাবাহক পঞ্চককে তাই অচলায়তনে 'দুর্লক্ষণ' বলে চিহ্নিত করা হয়। বালক সুভদ্র কৌতূহলের বশে আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে দিলে তাকে ভয়ংকর পাপ হিসেবে বিবেচনা করে সকলেই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করানোর জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। উপাধ্যায় যখন বলেন "তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।"—তখন মানবতার ওপরে শাস্ত্রকে স্থাপন করা হয়। আর শিক্ষালয়ের অচলায়তনে পরিণত হওয়াও নিশ্চিত হয়ে যায়।

» দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে সেখানে যূনকেরা লড়াই করতে এসেছিল। আপাতভাবে চণ্ডকের হত্যা এবং দশজন যূনককে কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শোধ নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য হলেও, আসলে তারা এসেছিল অচলায়তনের পাপের প্রাচীরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে।

প্রশ্ন ৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর >> কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ; প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এটি বাংলা চলিত গদ্যে লেখা প্রথম গ্রন্থ। এর মধ্যে তৎকালীন কলকাতার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অবিকল ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি লোকমুখে উচ্চারিত ধ্বনিরূপ যথাযথ রাখার জন্য তিনি বানানকেও উচ্চারণের অনুরূপ করার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া, এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অবদানগুলি হল—

১. কলকাতা ও কাছাকাছি মফস্‌সল অঞ্চলের মানুষের প্রতিদিনকার জীবনচিত্রের প্রকাশ ঘটানো।

২. তৎকালীন সমাজের নানা ধরনের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া।

৩. এই গ্রন্থে সমাজের সকল স্তরের মানুষের ছবি ফুটে উঠেছে। চড়ক পার্বণের রঙ্গ থেকে শুরু করে গাজন, মাহেশের রথ, দুর্গাপুজো প্রভৃতির বর্ণনা যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় জমিদার, ভিখারি, কেরানি, দোকানি, হাটুরে, পুরুত ঠাকুর প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষের বর্ণনা।

৪. ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে শুভবোধ জাগানো ছিল আলোচ্য গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. গ্রন্থটিতে যেমন প্রবাদ-প্রবচনের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, তেমনই দেখা যায় লেখকের সাংবাদিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তদ্ভব বা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে অনায়াস দক্ষতা।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সেই সময়কার কলকাতার সমাজ এবং বাংলা ভাষার চালচিত্র এ গ্রন্থে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ৬ বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবদান সম্পর্কে লেখো।

উত্তর >> বাংলা গদ্যের বিকাশপর্বের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম হল প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটির জন্য। বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে প্যারীচাঁদের গদ্যরচনাকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

১. **প্রবন্ধ রচনা :** 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎ কিঞ্চিৎ' (১৮৬৫)।

২. **জীবনীমূলক :** 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮)।

৩. **সমাজ-সংস্কারমূলক রচনা :** 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেদের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯)।

৪. **ব্যঙ্গাত্মক নকশাজাতীয় রচনা :** 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)।

⑤ **কথোপকথনমূলক নীতি-আখ্যান :** 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করলেও প্যারীচাঁদের মূল পরিচিতি কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটির জন্য। গ্রন্থটিতে উনিশ শতকের এক ধনী পরিবারের আদুরে সন্তানের অনাচার, লাম্পট্য, দুর্নীতি, মদ্যপানের প্রতি প্রবল আসক্তি ইত্যাদি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্র, এমনকি তাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত এই গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। মৌখিক ভাষা, সাধুভাষা আর সমকালীন যুগের কলকাতার উপভাষার যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়েছেন লেখক। আলালী ভাষার গঠনরীতি সংস্কৃতের অনুসারী বলে এর ক্রিয়াপদে সর্বদা সাধুরীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। এক কথায়, সমকালের সমাজ ও বাংলা ভাষাকে বোঝার জন্য 'আলালের ঘরের দুলাল' আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি গ্রন্থ।